শিশুর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু কাম্য নয়

সেলিনা আক্তার

মা-বাবার চোখের মণি লতা। দিন দিন লতা খুব চঞ্চল হয়ে উঠছে। কখন কোথায় যায় সারাক্ষণ চোখে চোখে রেখেও সামলানো দায়। লতার বাবা সোহেল বাড়িতে থাকলে তাকে নজরে রাখে, তখন লতার মায়ের জেসমিনের কাজে একটু সাহায্য হয়। সকালের খাবার খেয়ে সোহেল বেরিয়ে গেলে জেসমিন লতাকে খাবার দিয়ে বসিয়ে ভাবে ও খেতে থাকুক এ সুযোগে ক্ষেত থেকে কয়টা টমেটো তুলে আনি, রান্নার সময় কাজে দেবে। কিছুক্ষণ পর জেসমিন ফিরে এসে দেখে লতার খাবার পড়ে আছে কিন্তু ও নেই, জেসমিন চমকে ওঠে। এদিক-ওদিক খুঁজতে গিয়ে কোথাও না পেয়ে প্রতিবেশীদের সহায়তায় আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। এ সময় বাড়ির পাশের ডোবায় লতাকে ভাসতে দেখে সংজ্ঞা হারায় জেসমিন।

আমাদের দেশে প্রতিবছর পানিতে ডুবে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। প্রাণ হারানোর দিক থেকে শিশুর সংখ্যাই বেশি। দেশে প্রতিবছর ১৪ হাজারেরও বেশি শিশুর মৃত্যু হয়। বছরে যে সময়গুলোতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, সে সময়ে এমন মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে যায়। পানিতে ডুবে সবচেয়ে বেশি মারা যায় এক থেকে চার বছর বয়সি শিশু। দ্বিতীয় ঝুঁকিপূর্ণ বয়স হলো পাঁচ থেকে নয় বছর। বাংলাদেশে এক থেকে ১৭ বছরের শিশুদের অপমৃত্যুর প্রধান কারণ পানিতে ডুবে মৃত্যু, যা নিউমোনিয়া, অপুষ্টি ও কলেরায় ভুগে মৃত্যুর চেয়েও বেশি।

পানিতে ডুবে মৃত্যু একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্যগত বিষয়। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যু বেশি। এটি প্রতিরোধে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। মেয়েশিশুরা যেহেতু বেশি সুবিধাবঞ্চিত, তাই তাদের এ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করতে মনোযোগী হতে হবে।পানিতে ডুবে মৃত্যু একটি নিরব ঘাতক। এটি প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন হতে হবে।

এক্ষেত্রে প্রথমেই জানতে হবে কোন কোন কারণে শিশুরা পানিতে ডুবে প্রাণ হারাচ্ছে। শিশুদের পানিতে ডোবার অন্যতম কারণ হলো অভিভাবকদের অসর্তকতা, শিশুদের প্রতি নজরদারি না থাকা, দেখভাল করার লোকের অভাব, তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা সর্ম্পকে জ্ঞান না থাকা, বড়ো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাঁতার না জানা, জীবিত উদ্ধারের পর দেরিতে হাসপাতালে আনা প্রভৃতি অন্যতম। সাধারণত ৫ বছরের কম বয়সি শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। কারণ এ বয়সের শিশুদের সাঁতার শেখানো যায় না এবং নিজেদের বিপদ বা নিরাপত্তা সর্ম্পকে তাদের কোনো ধারণা থাকে না। পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর এ হার চট্টগ্রাম জেলায় সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ হলো সঠিক তত্ত্বাবধান ও শিক্ষার অভাব। পানিতে ডোবার এমনি ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে আমাদের দেশের হাজার হাজার শিশু। বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়! পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর এই নিরব মহামারির ভয়াবহতা বোঝাতে এ তথ্যটুকুই যথেষ্ট।

পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু—মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোয় এটি একটি বড়ো সমস্যা। পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার প্রধান কারণ হলো সাঁতার না শেখা। সাধারণত ১২ থেকে ১৫ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা হাঁটতে শেখে এবং নতুন এই অভিজ্ঞতার পুরোটাই তারা উপভোগ করতে চায়। একজন শিশুকে সাঁতার শেখানোর সঠিক বয়স ৫ বছর। কিন্তু দেশে এ বয়সে খুব কম শিশুকেই সাঁতার শেখানো হয়। বাড়ির পাশে অপ্রয়োজনীয় ডোবা বা জলাশয় থাকাও শিশুর পানিতে ডুবে মৃত্যুর অন্যতম কারণ। তাই শিশুর অকাল মৃত্যু রোধে আমাদের এসব দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কোনো শিশু পানিতে পড়ে গেলে তার শ্বাসনালি দিয়ে পানি ফুসফুসে ঢুকে যায়। ফলে শ্বাসপ্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হয়ে শরীরে অক্সিজেন কমে যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড জমে যায়। দ্রুত উদ্ধার না করলে শ্বাস বন্ধ হয়ে শিশুটি মারা যায়। সেক্ষেত্রে দ্রুত উদ্ধার করে শিশুকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে এবং নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা কিছু সংস্কার যেমন শিশুকে পানি থেকে তুলে মাথায় নিয়ে ঘোরানো, পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করা, ছাই বা লবণ দিয়ে শিশুর শরীর ঢেকে দেওয়া বা তাকে বমি করানোর চেষ্টা করানো—এসব করে সময় নষ্ট করা যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে।

সব সময় খেয়াল রাখতে হবে শিশু যেন একা একা কোনো জলাধারের কাছে না যায়। বাড়ির পাশের অপ্রয়োজনীয় ডোবা বা গর্তগুলো ভরাট করা যেতে পারে, যাতে সেখানে পানি জমতে না পারে। বাড়ির পুকুরের চারপাশে বেড়া দেওয়া যেতে পারে। বাড়িতে পানিভর্তি পাত্র বা বালতি সব সময় ঢেকে রাখতে হবে। শিশুর বয়স ৫ বছর হলে তাকে সাঁতার শেখানো উচিত। এতে ঝুঁকি কমবে। শিশুকে একা পানিতে নামতে দেওয়া যাবে না।

একটু সচেতন হলে প্রতিরোধযোগ্য এ দুর্ঘটনার হার অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই মৃত্যু প্রতিরোধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে। এগুলোর মধ্যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, পাঁচ বছরের অধিক বয়সি শিশুদের সাঁতার শেখানো ও প্রাথমিক চিকিৎসা অন্যতম। সারা দেশব্যাপী প্রাক– প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রমে বেশিসংখ্যক শিশুর অন্তর্ভুক্তি পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

হেলথ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভের তথ্য মতে, দেশে শিশু মৃত্যুর ৬০ শতাংশই ঘটে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে। তাই এসময় যদি শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা যায়, তাহলে শিশু মৃত্যু অনেকটা রোধ করা যায়। দিবাযত্ন কেন্দ্রে অবস্থানের সময় শিশুদের

জন্য তাদের বয়স উপযোগী খেলাধুলা, বিনোদনমূলক বিভিন্ন কিছুর উপস্থাপন কিংবা প্রাক প্রাথমিকের নানা–শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। ৫ বছরের অধিক বয়সি শিশুদের অবশ্যই সাঁতার শেখানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এই দক্ষতা আজীবন কাজে লাগবে। পুকুরের চারপাশে যতটুকু সম্ভব নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হলে তা শিশুদের নিরাপত্তা বাড়াবে। কেউ ডুবলেও তাকে উদ্ধারের পরপর তার শ্বাস ও হার্ট চালু করার যেসব প্রাথমিক উদ্যোগ আছে সেগুলো মানুষকে শেখানো বা প্রশিক্ষণ দেয়া খুবই জরুরি। কেননা হাসপাতালে নিয়ে আসার আগে অনেক শিশু মারা যায়। তাই যারা উদ্ধার করেন তাদের যদি প্রাথমিক জ্ঞান থাকে, তাহলে অনেক শিশু বেঁচে যাবে।

বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যেরূপ প্রচার–প্রচারণা ও উদ্যোগ দেখা যায়, পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে সে ধরনের পদক্ষেপ পর্যাপ্ত নয়। অথচ পানিতে ডুবে প্রতিবছর হাজার হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। গবেষণার দেখা গেছে যেসব উপজেলায় দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে পানিতে ডুবে যওয়ার ঘটনা প্রায় ৮৫ শতাংশ কমে গেছে। তাই দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ সরকারের নানা উদ্যোগের পাশাপাশি অভিভাবকদের সচেতনতা, প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারে।

সিআইপিআরবি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ‘সুইমসেফ’ প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা শেখানো হচ্ছে। এই প্রোগ্রামের আওতায় দেশের ২৫ জেলায় ছয় লাখের বেশি শিশুকে সাঁতার শেখানো হয়েছে। ১০ হাজার কমিউনিটি ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং লক্ষাধিক অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ককে সচেতন করা হয়েছে।

হাজার হাজার সম্ভাবনাময় অবুঝ প্রাণের এমন করুণ পরিণতি কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মানুষ সচেতন না হলে কোনো পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

#

পিআইডি ফিচার